বৃহস্পতিবার, ২৫ আশ্বিন, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ৬৭

জাপানে ভোট, সারা বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে শিনজোর দিকে

জাপানে সংসদের নিম্নকক্ষে ভোট হতে চলেছে চলতি মাসের ২২ তারিখে। প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের ভাগ্য পরীক্ষা নিয়ে সারা বিশ্বে কমবেশি আলোচনা চলছে। এই মুহূর্তে জাপান জুড়ে চলছে সব দলের নির্বাচনী প্রচার। প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের সমর্থকরা যেমন রাস্তায় নেমে তার ইতিবাচক কাজকর্ম তুলে ধরেছেন দেশবাসীর কাছে, তেমনই অ্যাবের বিরোধীরাও পাল্টা প্রচারে নেমেছেন। অ্যাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, স্বজনপোষণ ও ক্ষমতায় থেকে অনুগতদের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের সর্বত্রই ক্ষমতাসীন প্রধানদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনও না কোনও অভিযোগ উঠছে। বোঝা যায় যে, ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে কার্যত কেউই মুক্ত নন। তবে জাপানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে অ্যাবে ভারতে এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে গুজরাতে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের সূচনা করেন। এই বুলেট ট্রেন অবশ্যই গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির হাতিয়ার। একইভাবে ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্যকে হাতিয়ার করেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে। তবে সব কিছুর ওপরে জাপানে এখন আলোচ্য বিষয় উত্তর কোরিয়ার হুমকি। পারমাণবিক যুদ্ধের যে হুমকি উত্তর কোরিয়া বারবার দিচ্ছে জাপানের কাছে অবশ্যই তা চিন্তার কারণ। ভোটের বাজারে সব কিছু ছাপিয়ে প্রচারে প্রাধান্য পেয়েছে পারমাণবিক শক্তিতে বলীয়ান উত্তর কোরিয়ার যুদ্ধের হুমকি। কারণ এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃস্বপ্ন এখনও জাপানকে তাড়া করে। আর হিরোশিমা, নাগাসাকি নয়, এটাই জাপানের শান্তিকামী মানুষের শ্লোগান। এরই পাশাপাশি রয়েছে কয়েক বছর আগের সুনামির ধাক্কা। এসব সামলে জাপানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে। এটা কম কথা নয়।

জাপানে সংসদের নিম্ন কক্ষের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পদে শিনজো অ্যাবে। ক্ষমতায় ফের আসতে গেলে তাকে ৪৬৫টি আসনে জিততে হবে। অ্যাবের দলের মূল হাতিয়ার উত্তর কোরিয়ার হুমকি ও আগ্রাসী মনোভাব। এখন দেখা যাক, কে হতে চলেছেন জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। ভারতেও প্রতীক্ষা ফলাফলের।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

–যাকে অনেক সাধ্য সাধনা করে তবে পাওয়া যায়! তবে একটা গান শোনো–

গিরি! গণেশ আমার শুভকারী।–

পুজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী
যাও হে গিরিরাজ, আন গিয়ে গৌরী।।
বিশ্বকৃষ্ণমূলে পাতিয়ে বোধন,
গড়েশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।
ঘরে আনবো চন্ডী, শুনবো কত চন্ডী,
কত আসবেন দন্ডী, যোগী জটাধারী।।

"চন্ডী যেকালে এসেছেন–সেকালে কত যোগী জটাধারীও আসবে।" ঠাকুর হাসিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার , বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন–''আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি –এঁদের (যাত্রাওয়ালদের) আবার আমি গান শোনাচ্ছি।" নীলকণ্ঠ–আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আজ হ'লো। শ্রীরামকৃষ্ণ(সহাস্যে)–কোনো জিনিস বেচ্‌লে এক খামচা ফাউ দেয়–তোমরা ওখানে গাইলে, এখানে ফাউ দিলে। (সকলের হাস্য)।

দিনপঞ্জিকা

২৫ আশ্বিন, ভাঃ ২০ আশ্বিন, **১২ অক্টোবর**, ২৫ আহিন, সংবৎ ৭ কার্ত্তিক বদি, ২১ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১২। **বৃহস্পতিবার**, সপ্তমী দিবা ঘ ১০।৯মিঃ। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।৫২ মিঃ। পরিঘযোগ দিবা ঘ ১১।৫মিঃ। ববকরণ, দিবা ঘ ১০।৯ গতে বালবকরণ, রাত্রি ঘ ৮।৫৯ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**–মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ঘ ১২।৫২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। **মৃতে**–একপাদদোষ, দিবা ঘ ১০।৯ গতে দোষ নাই, দিবা ঘ ১২।৫২ গতে দ্বিপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ২।১৮ গতে ৫।১২ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১১।২৪ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। **যাত্রা**–নাই। **শুভকর্ম্ম**–দিবা ঘ ১০।৯ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। **বিবিধ**–অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ১০।৯ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও মাসদগ্ধা। **গোস্বামিমতে অর্দ্ধরাত্রে গোবর্দ্ধনগিরিস্থ শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পূজা। বিশ্বচক্ষু দিবস। অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৭।১৩ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৫০ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১৫ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৫ আশ্বিন, ভাঃ ২০ আশ্বিন,১২ অক্টোবর, ২৫ আহিন, ২১ মহরম। উঃ ঘ ৫।৩৬, অঃ ঘ ৫।১২ বৃহস্পতিবার, সপ্তমী দিঃ ঘঃ ১০।৯। ২৫ আশ্বিন সৈঃ আসানুল্লা শাহ আল কাদেরী রহঃ উরস, আলামপুর, মাধবডিহি, বর্ধমান। ২১ মহরম হজরত ইমাম জয়নুল আবেগীন (রাঃ)-এর পর্দা।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

জঙ্গলমহলের লোক সংস্কৃতি

সুভাষ পাল

ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার মধ্যে ধলভূম মহকুমায় সাংস্কৃতিক সম্পদ বিশেষ মহত্বপূর্ণ। সিংভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জঙ্গলে পরিপূর্ণ, সেইজন্য জঙ্গলমহল বলে অভিহিত করা হয়। জঙ্গলমহলে শাল, পিয়াল, ধ, কুড়চি, আকীর্ণ, বনভূমিতে করম-ধরম, বাঁধনী, টুসু, সরহুল, ঝুমুর, বিহাগীত এবং পাতাকার্বি, জাওয়া, করমপচুয়া, নাচনী নাচে উদ্দাম যৌবনের নির্ভীক প্রকাশ তাই বিষ্ময়কর এই সিংভূম। পরেশনাথ, দলমা, শুশুনিয়া, গোটাশিল, কানাইশোর, ও দামোদর, ধারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, ডুলং, বাটা, কুমারীর আশীর্বাদে প্রাণশচুয্যে ভরা জঙ্গলমহল অঞ্চলে কুর্মি (সাহাত) ও আদিবাসী সংস্কৃতি।

এই অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির যোগসূত্র পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরে সঙ্গে আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্থানীয় লোকসভার বৈষম্য থাকলেও উৎসব পূজা-পার্বণ ও আচার অনুষ্ঠান প্রায় একই রকমের। সারা পৌষ মাস ধরে এই বিশাল অঞ্চলের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে টুসু গানের মন মাতানো গ্রাম্যসুরে। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তির দিনে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই এই লোককণ্ঠের সুর বেজে ওঠে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবারই কণ্ঠেই আর পরিসমাপ্তি ঘটে পৌষ সংক্রান্তির দিনে।

এই জঙ্গলমহল অঞ্চলের কুর্মি ও আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যে পৌষ মাসে টুসু, ভাদ্র মাসে করম ও ভাদু, আশ্বিন মাসে ঝুমুর, ফাল্গুন মাসে পাঁতা আর মনসা মঙ্গলের জাতি গান এখানের বৈশিষ্ট্য।

জন-জীবনের মুখ্য পার্বণ টুসু। নবান্ন উৎসবে নাচে গানে টুসু লক্ষ্মীকে আমন্ত্রণ জানায়। কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি আছে মালভূমন্তিত কাশীপুরের মহারাজা প্রথম টুসু পুজোর প্রচলন শুরু করেন। অনেকের মতে কাশীপুরে মহারাজ কন্যার কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় সন্তান প্রাপ্তির মানসে প্রথম টুসুদেবীর আরাধনা করেন। দেবী তুষ্ট হয়ে বরদান করেছিলেন বলে অনেকেরই বিশ্বাস।

ঝাড়খণ্ডের লোকভাষায় রচিত টুসু গান নিপুণ হাতের ছোঁয়া নয়। তবুও নিভৃত হৃদয়ের আশা রাগ অনুরাগ ঈর্ষা তৃপ্তিতে ভরা দৈনন্দিন জীবনের ছোঁয়া লাগানো এক বিচিত্র মাধুরী। এইসব রচনা এই জঙ্গলমহল অঞ্চলের স্থানীয় ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি বলা যায়। বর্তমানে শিক্ষিতদের মধ্যেও টুসু গান রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

তরা খায়ো লে ল সজনী
গুড় গুঁজা চিনি।
তরা খায়ো লে ল পরটা
কোম্পানির আটা।।

কোম্পনির চিনি আর আটা পাচার হচ্ছে, আপনজন মজা করে খাও। এরই মধ্যে গ্রামের প্রণয়িনীকে জেলার সদরে নিয়ে

শহরে জীবনের সঙ্গে পরিচিত করার বাসনা জেগে ওঠে।

আমার মন ভালবাসা
তোকে লিয়ে যাব চাইবাসা।

টুসু গান বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত ছোট ছোট গান, যা প্রায় দু-চার পংক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুলীর্ঘ গানের প্রচলন নেই বলা চলে। এই গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার স্থানীয় ভাষা ও শব্দের ব্যবহার। অভিনব ছন্দ ও অলঙ্কার আর মিলনান্ত চরণ। টুসু গান গ্রাম্য ভাষা উপভাষা হলেও অশ্লীলতা দোষ থেকে মুক্ত।

ঝিঙফুল মনে রাইখবে
জলকে যাবার বেলা
ডাইকবে।

সাঁঝের বন্ধু ঝিঙেফুল, আমায় ডেকো জল আনবার বেলায়। গার্হস্থ্য জীবনের আনবার বেলায়। গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিদিনের সমস্যার কথা, আশা-নিরাশাকে ঘিরে রাখে।

'ই ডুংরী, উ ডুংরী পিয়াল পাইকল,
আর খাব নাই দিদি মন ভাংইল।'

রসালো, পিয়ারা ফলে ভরা পর্বতারণ্য। কিন্তু ছোট বোন আনময়া। তাই তার অধিক ভোজনের অনিচ্ছা কিংবা।

চল বিহান কেঁদ খাতে যাব,
কেঁদ তলে হুকুম গুড়ুমলাচ লাগাই দিব।

বেয়ানকে সঙ্গে নিয়ে কেঁদ গাছের তলায় গিয়ে নাচ করবার আমন্ত্রণ জানায়।

আম গাছে আম নাই
ফাবড় কেনে মার হে,
তোমার দেশে আমি নাই
আঁখি কেনে ঠার হে।

ঢিল ছুঁড়ছে কেন? তুমি বিদেশি, ইশারা করে লাভ কি?

ভাদ্রের অন্তিমলগ্নে মনসার 'জাত' গান ডমরু ধ্বনিতে অনুরনিত হয়ে ওঠে সায়াহ্ন আকাশ। গো প্রতিপদের সময় বাঁধনা (গো-বন্দনা) ধলভূমের অন্যতম প্রধান পরব। পল্লী অঞ্চলে দুর্গাপুজার চেয়েও এর আকর্ষণ বেশি। নব বধূরা ফিরে আসে পিত্রালয়ে আমন্ত্রিত হয় জামাতার দল। কৃষক কলা মায়ের সঙ্গে গোয়াল পুজো করে। এমনি করে আবার মধুমাস আসে। সাঁওতাল পল্লীতে মাদল বেজে ওঠে দ্রুত লয়ে। মেয়ে পুরুষ তখন হাতে হাত মিলিয়ে ভাবপাতায় তাই পাতা নাচ মাদল রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দেয় গানের উন্মাদনা।

আসরে মাদল বাজে নাচনী এসেছে সেজে।

নামা তং এ অঙ্গ দোলায়
বাঁশরিয়া বাঁশিটি বাজায়।

আমরা আবার দেখতে পাই---এই পাতা নাচের মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের সমস্যার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। পর্ণ-প্রথার বিরুদ্ধে ঘৃণিত সোচ্চার ধ্বনি।

মা বোনেদের আবেদন
দূর করে বরপণ,
ঐক্য সুরে তোল সব
আওয়াজ।
পণপ্রথা অসামাজিক কাজ।।

এই পণপ্রথার ফলে কি বিভীষিকাময় তার পরিমান হয়। কত গরিবের মেয়ে হারায় জীবন বিষ খেয়ে মাতা-পিতার মুখ দেখানো ভার এই কু প্রথা রেখো না সরকার।

এমনিভাবে পাহাড়ি পথ চেয়ে উঁচু-নীচু আল পেরিয়ে গাঁয়ের মানুষ পারস্পরিক ভাব বিনিময় করে টুসু গানের মাধ্যমে। এই গানের মাধ্যমেই আমরা সমাজের বাস্তব চিত্রটি উজ্জ্বল ভাবে দেখতে পাই।

শুধুই প্রথাগত শিক্ষা নয়, চাই ধর্মশিক্ষাও

গদাধর রানা
শেষ পর্ব

আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ভুলেছি, ভুলেছি শংকরাচার্য, জয়দেব, ভূদেব, রাজা রামমোহন, ভারতচন্দ্র, চৈতন্য, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ মহাজন ও অবতারদের কথা। ভুলেছি, স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণ, শরৎ, বঙ্কিম, রবিঠাকুর, তারাশংকর, আশুতোষ প্রভৃতি মহাজনদেরকে। ভুলেছি তাঁদের কালজয়ী বাণীসম্পদকে ও তার মর্মকে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ টয়েনবি তাই বললেন, 'আত্মবিসর্জন নয়, নিজেদের হারানো গৌরবময় অতীতকে নতুন ক'রে গ্রহণ করাই হ'ল নবজাগরণ।' এ প্রসঙ্গে ম্যাক্সমুলারের উক্তি স্মরণ পড়ে, –" A people that could feel no pride in the past in its history, had lost the main story of its moral character।"

জগতের ইতিহাসই হচ্ছে কয়েকজন পবিত্র, ধার্মিক, চরিত্রবান ও শ্রদ্ধাস্পদ মানুষের ইতিহাস। ধর্ম বলে– মানুষের লৌকিক জীবনের সঙ্গে পারমার্থিক জীবনের একটি সেতু রচনা করা চাই। আধুনিক চিন্তাই হচ্ছে ভোগবাদী বুদ্ধিনির্ভর ও স্বার্থপরায়ণ–এহেন বোধের ক্ষেত্রে ধর্ম টেকেনা। কারণ, ঐ সব বোধে কোনো কল্যাণী চিন্তা ও ত্যাগের ভাবনা নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছি লেন, –''নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস।" T.S. Eliot বললেন, 'ঐতিহ্যকে অস্বীকার ক'রে কখনও আধুনিক হওয়া যায় না।' ভাবা যাক তো–এলিয়ট সাহেবের ঐ মন্তব্যে ধর্মবোধ জড়িয়ে নেই? তাই, আত্মসমীক্ষা চাই সবার আগে।

ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (secular) তা সত্য, কিন্তু সমস্ত ধর্মের প্রতি দেশের সহনশীলতা থাকলেও এক্ষেত্রে যথার্থ শিক্ষাতত্ত্বকে (Theory of Education) প্রবেশ করতে তেমনভাবে সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে, জায়গায় জায়গায় মৌলবাদ তার জায়গা ক'রে নিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি খুব সহজ শব্দ হলেও এর সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ খুবই কঠিন। স্বামীজী এই ধর্মনিরপক্ষেতার কথাই কত আগে বলেছিলেন, যাতে

ধর্মনিরপক্ষেতারই সুর শুনি—বললেন, একজন হিন্দুকে অবশ্যই ভাল হিন্দু হ'তে হবে, একজন মুসলিমকে ভাল মুসলিম হ'তে হবে। তাহলেই ঈশোপনিষদে নিহিত সূত্রটি এঁদের চিন্তনে সহায়ক হবে। তা হচ্ছে,–

''সর্ব্ব সত্বানি ভূতানি
আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব ভূতেষু চাত্মানং ততো ন
বিজুগুপ্সতে।''

বা গীতার সূত্রেও বলা হয়েছে,

''সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি
চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র
সমদর্শনঃ'' (৬/২৯)

এই যে সমদর্শনের লক্ষ্য–এটিই তো ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের বড় উদাহরণ। মোট কথা, ঊনবিংশ শতকে স্বামীজীর জীবনকে আশ্রয় ক'রে একটা যুগ যেন কথা ব'লে গিয়েছিল। কিসের কথা? আত্মোন্নতির কথা, প্রগতির কথা। এই তুলনায় অধুনা প্রবর্তিত নতুন ক 'রে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা অনেকটাই পিছনে থেকে যায়।

ছাত্রদের চরিত্র গঠনে দেশের সাম্প্রদায়িক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ধর্মকে রাখতেই হবে, তবেই শিক্ষা বাঁচবে। সমস্ত মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ বাড়িয়ে তোলার একমাত্র উপায় হ'ল ধর্মীয় অনুশাসন। তাই অনেকের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমানে যেন জাতীয় অগ্রগতির পথে বড় বাধাস্বরূপ। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ একদা বলেছিলেন, 'ধর্মশিক্ষা ছাড়া শিক্ষা কখনই সমাপ্ত হ'তে পারেনা।' যথার্থশিক্ষা ও যথার্থ ধর্ম যখন একাধারে একাকার হ'য়ে যাবে তখনই একটি সুসংহত সমাজ ও জাতি গড়ে উঠবে।

তবে হ্যাঁ, শিক্ষাতেও অর্থনীতির সূত্র নিহিত আছে। শিক্ষাকে শিল্প হিসাবে ভাবলেও শিক্ষার প্রভাবে সৃষ্ট উন্নত চারিত্রিক গুণসম্পন্ন নাগরিক তৈরি হবে, তারা হবে রাষ্ট্রের গর্ব, জাতির গর্ব। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে, যার দ্বারা তারা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে। দেখা যাবে, প্রথাগত শিক্ষা সার্থক হয়ে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা কালজয়ী হয়েছে। এরকমভাবে শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করলে বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের জীবনে নিরাপত্তা আনবে। শিক্ষা জীবনমুখী ও জীবনকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। এভাবে শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সাথে যুক্ত করলে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে, যা সামাজিক শোষণ প্রতিরোধে সহায়ক হবে। তাই স্বামীজী চেয়েছিলেন–শিক্ষার লক্ষ্য শুধু উপার্জন নয়, চাই মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। তখনই শিক্ষার্থীমাত্রেই হবে 'সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরম্'-এর একনিষ্ঠ উপাসক। হবে তারা যথার্থ খাঁটি মানুষ। তাইতো স্বামীজী একদা বললেন,–" মানুষ চাই, শুধু মানুষ চাই, আর সকলি হইয়া যাইবে।"

সম্পাদক সমীপেষু

ইস্ট ইন্ডিজ থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামটা এসেছে

ইতিহাস বলছে ইস্ট ইন্ডিজ থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নাম এসেছে। এই যে আমাদের ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষ দর্শনের জন্যই পরিব্রাজক হিসাবে বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন ইংরেজ বণিক র‍্যালফ ফিচ। এমন একটি সুন্দর দেশকে শুধু দেখার জন্যই নয়। এখানে এসে যদি ব্যবসা করা যায়, তারই পরিকল্পনা নিয়েই এসেছিলেন র‍্যালফ ফিচ। ১৫৮৩ সালের ৮ মার্চ ফিচ ইংরেজ বণিক নিউ বেরী ও তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে জাহাজে চেপেছিলেন। সেই জাহাজের নাম ছিল টাইগার। সেই জাহাজেই তিনি এসেছিলেন ভারতবর্ষে। সেদিন এই ভারত ভ্রমণে আসার দরুণ পর্তুগিজরা তাঁকে বন্দী করেছিল। ২ বছর কারাবাসের পর ১৫৮৫ সালের ৫ এপ্রিল মুক্তি পাবার পর সহযাত্রীসহ গোয়া থেকে বেরিয়ে পড়েন ভারতবর্ষের অভ্যন্তর ভ্রমণে। ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৫৮৫ সালে তিনি ও তাঁর সহযোগী চলে আসেন ফতেপুর সিক্রিতে। আগ্রা সেই সময় বিশাল বড় এলাকা ছিল। সেই সময় তিনি বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরতে ঘুরতে একসময় বাংলায় বাখরগঞ্জের বাকলা শহরে তিনি এসেছিলেন। একটা মনোরম দৃশ্যকে উপভোগ করার সাথে সাথে বাণিজ্যের ব্যাপারটাও ছিল। যেমন, হাওড়া জেলাতেই একটা বন্দর ছিল, সেখানে চাঁদ সওদাগর তাঁর ময়ূরপঙ্খী জাহাজ নঙর করেছিলেন। আজ সেখানে আর বন্দরটা নেই। সেখান দিয়েই এখন দ্বিতীয় হুগলি সেতুর রাজকীয় রাজপথটা চলে গেছে। এই বেতড় অঞ্চলটিতেই বন্দরটা ছিল। তখন এই বন্দরের নাম ছিল বেতড্ড বন্দর। যা আজ হাওড়া পৌরনিগমের ৪১,৪২ ও ৪৪ নং ওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছে এবং সুসজ্জিতভাবে সেজে উঠেছে। যাই হোক, ফিচসাহেব ১৫৮৯ সালের ৬ মার্চ বাংলাদেশ থেকে সিংহলে যান। তখন ঢাকায় পর্তুগিজদের আধিপত্য ছিল। ১৫৯৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বিলেতের অলডার ম্যানের বাড়িতে একদিন লন্ডন শহরের সবচেয়ে নামযাদা ও ধনী ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি বড় রকমের জমায়েতের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো। এই অলডার ম্যানের সেই বাড়িকে এখনও বলা হয় ফাউন্ডারস্ হল। পৃথিবীর পূর্ব দিকের দেশগুলিকে ইস্ট ইন্ডিজ বলা হত। এই নাম থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নাম রাখা হয়েছিল। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবদান বোধ হয় ভারতবর্ষের মানুষ কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া ৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক